➤ **অন্যান্য আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সমস্যা :** পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় কিছু বিক্ষিপ্ত স্থানীয় সমস্যা আছে, যেমন—

(i) **জমির অবনমন বা জমি বসে যাওয়ার সমস্যা :** এটি মূলত রানিগঞ্জ-আসানসোল কোলিয়ারি অঞ্চলের সমস্যা। এ ছাড়া ভূগর্ভস্থ জল বেশি তুলে নেওয়ার কারণেও কলকাতা, উত্তর 24 পরগনা ও দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কিছু অঞ্চলে এই সমস্যা লক্ষ করা যায়।

(ii) **নদীখাতে পলি সঞ্চয়ের সমস্যা :** উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স অঞ্চলে এবং দক্ষিণবঙ্গে হুগলি নদী ও অন্যান্য নদীতে জোয়ারের জল যতদূর পৌঁছায়, বিশেষত সেই স্থান পর্যন্ত নদীতে পলির সঞ্চয় বেশি হয়। উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া ও কলকাতা জেলা সংলগ্ন এলাকায় এই সমস্যা নদীর নাব্যতা নষ্ট করে।

(iii) **মাটির ক্ষয় :** বীরভূমসহ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশের জেলাগুলিতে লাল মাটি ও ল্যাটেরাইট অঞ্চলে মাটির ক্ষয়ের সমস্যা আছে।

(iv) **টর্নেডো ও ক্রান্তীয় ঝড় :** পশ্চিমবঙ্গের উপকূল সংলগ্ন জেলাগুলিতে টর্নেডো ধরনের উচ্চগতিবেগসম্পন্ন (ঘণ্টায় 300–350 কিমি.) ঝড় ও ক্রান্তীয় ঝড়ের (গতিবেগ ঘণ্টায় 63 কিমি.-র বেশি) আশঙ্কা আছে। ওড়িশায়, বাংলাদেশে ঝড়ের সমস্যা বেশি।

15.2. দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যা (Problems of the Darjeeling Hills) :

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ। 2017 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা দুটি একটি জেলা হিসাবে দার্জিলিং জেলা নামে পরিচিত ছিল। দার্জিলিং হিমালয়কে ভিত্তি করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত পার্বত্য এলাকাকে দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল (Darjeeling Hills) বলা হয়। দার্জিলিং ও কালিম্পং হল পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে উত্তরের দুটি জেলা (চিত্র 15.1)।

1. **অবস্থান :** দার্জিলিং জেলার দুটি মহকুমা (সাব-ডিভিশন), যথা—সদর (দার্জিলিং) ও কার্শিয়াং এবং কালিম্পং জেলা দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল গঠন করেছে। এই অঞ্চলের চতুঃসীমা হল উত্তরে সিকিম; দক্ষিণে 400 মিটার সমোন্নতি রেখা (contour); পূর্বে দুটি দেশ (ভুটান ও বাংলাদেশ) এবং দুটি জেলা (জলপাইগুড়ি এবং উত্তর দিনাজপুর) ও পশ্চিমে নেপাল।

2. **দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যা :** দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যাকে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে চার ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—

(i) প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সমস্যা—যেমন ধস বা ভূমিধস ও ভূমিকম্প;

(ii) অর্থনৈতিক সমস্যা—চা, কাঠ ও পর্যটন শিল্পের সমস্যা;

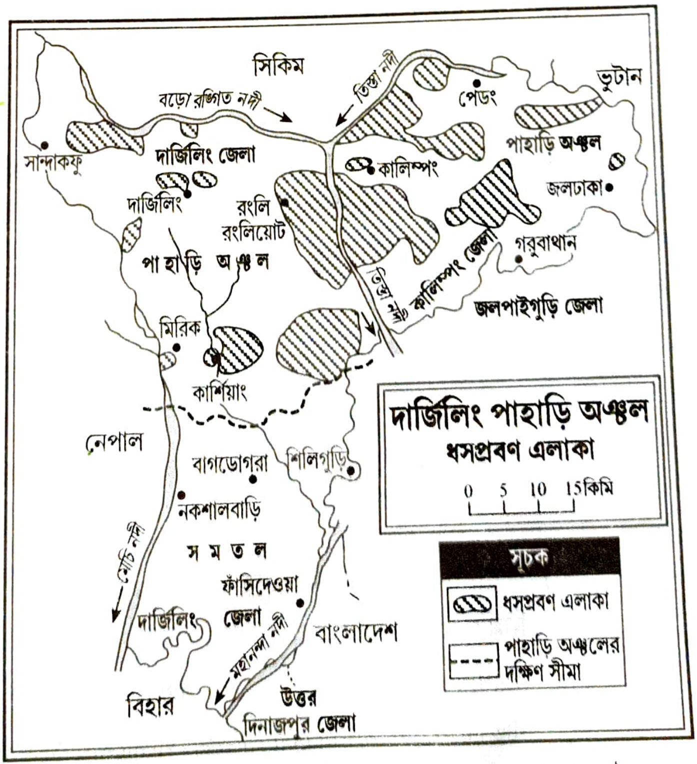

চিত্র : 15.1. - দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে ধসপ্রবণ এলাকার বণ্টন

(iii) পৌর ও পৌর পরিসেবাগত সমস্যা—দ্রুত নগরায়ণ ও পানীয় জলের সমস্যা;

(iv) সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা—স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত মতভেদ ও রাজনৈতিক সমস্যা।

(i) ধসের সমস্যা : দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের অন্যতম প্রাকৃতিক সমস্যা হল ধস (landslide)। সাধারণত বর্ষাকালে মাটি জলে সম্পৃক্ত হলে বা মাটির মধ্যে জলের জোগান বাড়লে জলের বাড়তি চাপের ফলে অথবা ভূমিকম্পের কারণে পাহাড়ের খাড়া ঢাল বরাবর মাটি, শিলাচূর্ণ মাধ্যাকর্ষণের টানে নীচে নেমে আসে। ফলে ধস হয়।

ধস দার্জিলিং-এর বহুদিনের পুরানো সমস্যা। ইংরেজরা দার্জিলিং শহর গড়ে তোলার সময় থেকেই অর্থাৎ 1835 সালের পর থেকে (1852 সালে দার্জিলিং স্যানাটোরিয়াম নির্মিত হয়) ধসের সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিশেষত দার্জিলিং লাইট রেলওয়ে (বা জনপ্রিয় ভাষায় "দার্জিলিং টয়ট্রেন" নামে পরিচিত ও যার নির্মাণকাল 1879–1881 সাল) এবং হিলকার্ট রোড—এই দুটি পরিবহণ পথই দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের ধসপ্রবণ এলাকার ওপর দিয়ে গিয়েছে। বস্তুত তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার ধসের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে 1899 সালে Darjeeling Landslip Committee গঠন করে। ভারত স্বাধীন হওয়ার পরে GSI (Geological Survey of India—ভারতীয় ভূবৈজ্ঞানিক সর্বেক্ষণ) 1950 সালের পর থেকে বহুবার ধসের আঞ্চলিক সমীক্ষা করেছে এবং ধসের কারণ ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি জানিয়েছে। এ ছাড়া বহু ভৌগোলিকও দার্জিলিং-এর ধস-সমস্যা পর্যালোচনা করেছেন।

➤ **দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে ধসের কারণ :**

(a) দুর্বল শিলা : দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের প্রধান শিলা হল নিস (gneiss) ও ফিলাইট (phyllite) শিলা। এরা রূপান্তরিত শিলা। আবহবিকারের (weathering) প্রভাবে শিলা দুর্বল ও ভঙ্গুর হলে মাটির জল শিলার দুর্বল পত্রায়ণ (foliation) তলে প্রবেশ করে। এতে শিলার সংহতি নষ্ট হয়। শিলা ধস নামার উপযুক্ত হয়।

(b) খাড়াই ভূমিঢাল : দার্জিলিং-এর পাহাড়ি ঢালে বিশেষত নদীর দু-পাশে ভূমিঢাল গড়ে 20°–40° ডিগ্রি। অনেকক্ষেত্রেই তা 40°-এর বেশি হয়। এই খাড়াই ঢাল দুর্বল শিলাগঠিত হলে ধস নামে।

(c) প্রচুর বৃষ্টিপাত : দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে গড়ে বছরে 250 সেমি. থেকে 500 সেমি. বৃষ্টিপাত হয়। এই ভারি বর্ষণ দুর্বল শিলা ও খাড়াই ভূমিঢালে ধস নামার অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তাই প্রতিবছর দার্জিলিং পাহাড়ে ছোটোবড়ো প্রচুর ধস নামে।

(d) মাটির মধ্যে জলের চাপ : পাহাড়ি ঢালে বৃষ্টির জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করার পরে অপ্রবেশ্য শিলার ওপর দিয়ে ওই জল যত নীচের ঢাল বরাবর নামে ততই নিম্নঢালে জলের চাপ বাড়ে ও দারণ-ফাটল বরাবর সেই জল বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন ধস নামে।

(e) অরণ্যের বিনাশ বা ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের আচ্ছাদন না-থাকা : পাহাড়ি ঢালে উদ্ভিদের আচ্ছাদন কম থাকলে জল মাটির মধ্যে প্রবেশ করে মাটি ও শিলাচূর্ণকে অস্থিতিশীল (unstable) করে তোলে। ফলে ধসের সৃষ্টি হয়।

(f) অপরিকল্পিত জমির ব্যবহার ও দুর্বল ঢালে বহুতল বাড়ি নির্মাণ : দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলের বহু জায়গায় স্থানীয় গাছের প্রজাতি (যেমন—বার্চ)-এর পরিবর্তে ধুপি গাছ (*ক্রিপটোমেরিয়া জেপোনিকা*) লাগানোর কাজ চলছে দীর্ঘদিন ধরে। এই গাছের ঝরাপাতা মাটিতে বিয়োজিত হতে সময় বেশি লাগে, মাটিতে অম্লের পরিমাণ বাড়ে। ফলে বড়ো গাছের নীচে ছোটো গাছ বিশেষ জন্মায় না। এতে মাটির মধ্যে জলের অনুপ্রবেশ বেশি হয়।

দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমির ব্যবহার

ভূমি ব্যবহারের ধরন	জমির পরিমাণ (%)
1. বনভূমি	37·99
2. বসতি	33·75
3. চা-বাগিচা	17·22
4. নিট কর্ষিত জমি	4·28
5. বর্তমানে পতিত জমি	3·04
6. সিঙ্কোনা বাগিচা	1·89
7. অন্যান্য পতিত জমি	1·38
8. অন্যান্য	0·45

[তথ্যসূত্র : অজিত কুমার শীল, 2019, ভারতের ভূগোল]

এ ছাড়া খাড়াই দুর্বল পাহাড়ি ঢালে আগে বহুতল নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হত না। যেমন, ইংরেজ আমলে দার্জিলিং-এর "কাছারি"-র (অর্থাৎ জেলাশাসকের অফিস)-এর নীচে কনভেন্ট রোড—হরিদাস হাট্টা অঞ্চল ধসপ্রবণ বলে এখানে বড়ো বাড়ি তৈরির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল। ইদানিং দার্জিলিং শহরে হিলকার্ট রোড ও অন্যত্র প্রচুর বহুতল বাড়ি নির্মিত হয়েছে। আগামী দিনে ভূমিকম্প বা বড়ো ধস নামলে এই সমস্ত নির্মাণ বিপদের কারণ হতে পারে।

➤ ধসের সমস্যা মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ :

CPWD, PWD এবং অন্যান্য সংস্থা নিয়মিত ভাবে ধস সমস্যার মোকাবিলা করে। এক্ষেত্রে ধস ও ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার ভূপ্রাকৃতিক-ভূতাত্ত্বিক চরিত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এর মধ্যে অধিকাংশ ব্যবস্থা প্রযুক্তি ও নির্মাণ ভিত্তিক, যেমন—

(a) রাস্তার ঢালে (road bench) ধস নামলে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত ভূমিঢালকে পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। দেওয়াল মজবুত করার জন্য মোটা তারের জাল দিয়ে দেওয়ালকে ঘিরে রাখা হয়। এই দেওয়ালকে বলে "ওয়্যার ক্রেট ওয়াল" (wire crate wall)। এই দেওয়ালের সুবিধা হল যে, মাটির ভেতরের জল পাথরের ইটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। মাটির মধ্যে জলের চাপ বাড়ে না।

(b) রাস্তার ধারে ধস নামলে বা পাহাড়ে ঢাল কেটে বাড়ি নির্মাণের আগে উল্লম্ব কাটা ঢালে ধস রুখে দেওয়ার জন্য কংক্রিটের দেওয়াল দিয়ে ভূমিঢাল মুড়ে দেওয়া হয়। এই দেওয়ালকে বলে ব্রেস্ট ওয়াল (breast wall)। ব্রেস্ট ওয়ালের মধ্যে মাটির জল বেরিয়ে আসার জন্য ছোটো ছোটো ফোকর বা গর্ত রাখা হয়। এই গর্তগুলিকে "উইপ হোল" (weep hole) বলে।

(c) ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভূপৃষ্ঠে জলের প্রবাহকে নির্দিষ্ট খাতে পরিচালিত করা হয়। এর জন্য কংক্রিটের নিকাশি ব্যবস্থা নির্মাণ করা হয়। যেমন, হিলকার্ট রোড সংলগ্ন পাগলা ঝোড়া অঞ্চলে নির্মিত নিকাশি ব্যবস্থা।

(d) বড়ো কোনো নির্মাণের আগে মাটির ভারবহন ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়।

(e) বনসৃজন (afforestation) করা হয়।

(f) ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (GSI) প্রয়োজনীয় ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র প্রস্তুত করে।

(ii) **ভূমিকম্পের সমস্যা :** সমগ্র হিমালয় অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ। গিরিজনি প্রক্রিয়ায় হিমালয়ের উদ্ভব এখনও চলছে। ফলে মাঝে মাঝেই শিলার অন্তর্নিহিত চাপ মুক্ত হয় এবং ভূকম্পন হয়। দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল বহুবার ভূমিকম্পের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে, যেমন—অসম ভূমিকম্প (1897), শ্রীমঙ্গল ভূমিকম্প (1918), ধুবুড়ি ভূমিকম্প (1930), বিহার-নেপাল ভূমিকম্প (1934), অসম ভূমিকম্প (1950), নেপাল ভূমিকম্প (1966, 1980, 2015) ইত্যাদি। প্রসঙ্গত দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চল ভূমিকম্প প্রবণতায় জোন-IV (চার) অর্থাৎ "হাই রিস্ক" অঞ্চলের অন্তর্গত।

(iii) **চা শিল্পের সমস্যা :** দার্জিলিং পাহাড়ি এলাকা চা-বাগিচা ও চা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। দার্জিলিং-এর চা GI বা "জিওগ্রাফিক্যাল ইনডিকেশন" ট্যাগ-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্তমানে (2017) দার্জিলিং অঞ্চলে প্রায় 17,500 হেক্টর জমিতে 78টি চা-বাগিচা আছে। এখানে বছরে প্রায় 8000 টন চা উৎপন্ন হয়। স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষের প্রায় 50 শতাংশ চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। 1840 সাল নাগাদ দার্জিলিং-এ চা-বাগিচা প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়। ড. ক্যাম্পবেল এই কাজে অগ্রণী ভূমি পালন করেন।

বিগত প্রায় 150 বছর ধরে দার্জিলিং-এর চা শিল্পে যে-উন্নতি হয়েছে, তার অনেকটাই এখন হ্রাস পেয়েছে, কারণ—

(a) বৃষ্টিপাতের তারতম্য, আর্দ্রতার পরিবর্তন ও আবহাওয়ার বদলের প্রভাবে চায়ের উৎপাদন বার্ষিক 10,000 টন থেকে 8000 টন-এ নেমে গেছে।

(b) আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে চা-বাগানে শত্রু পোকার (pest) আক্রমণ লক্ষণীয় ভাবে বেড়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম "পেস্ট" বা শত্রু পোকা হল রেড স্পাইডার মাইট্‌স (Red spider mites) এবং টি মসকিটো বাগ্‌স (Tea mosquito bugs)। এ ছাড়া চা গাছে "বিল্‌সটার ব্লাইট" (Blister blight) রোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে চা-এর উৎপাদন কমেছে।

(c) দার্জিলিং অঞ্চলে বেশ কিছু চা-বাগান আছে যেখানে চা গাছ 75 থেকে 100 বছরের পুরানো। ফলে এই প্রাচীন বাগানগুলিতে চা-এর উৎপাদন কম। নতুন চা গাছ লাগানো এবং তাকে উৎপাদনের উপযুক্ত করে বড়ো করার জন্য যে-বাড়তি খরচ ও সময় দরকার হয়, তাতে বহু মালিক-পক্ষই রাজি নয়। ফলে চা-বাগানের ক্ষতি হচ্ছে। চা-এর উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সাম্প্রতিক কালে আবহাওয়া যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, সেই প্রেক্ষাপটে নতুন চা গাছ লাগালেই যে উৎপাদনের সমস্যা কাটবে, সে, ব্যাপারে অনেকেই নিশ্চিত নন। ফলে চা- বাগানের পুনর্নবীকরণের (renewal) কাজ ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে।

(d) সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে বহু চা-বাগানে চা তোলার কাজ বন্ধ ছিল। সামগ্রিক ভাবে এর ফলে দার্জিলিং-এর চা শিল্প মার খেয়েছে।

(iv) কাঠ শিল্পের সমস্যা : দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে কাঠের উৎপাদন একটি অতি পুরানো শিল্প। বাড়ি তৈরি করা, কাঠকয়লার (charcoal) উৎপাদন, আসবাব প্রস্তুত করা প্রভৃতি কাজে কাঠের ব্যবহার কয়েক শতাব্দী ধরে স্থানীয় লোকেরা করে আসছে। কিন্তু এর ফলে এই পাহাড়ি অঞ্চলে বনহননের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ধসের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন কংক্রিটের বাড়ি নির্মিত হচ্ছে। স্টিলের আসবাব কাঠের আসবাবের চেয়ে বেশি মজবুত বলে জনপ্রিয় হয়েছে। শীতের সময়ে ব্যবহারের জন্য "রুম হিটার"-এর প্রচলন হয়েছে। কাঠকয়লার চাহিদা কমেছে। দার্জিলিং-এ কাঠ শিল্পের সুদিন অস্তমিত হয়েছে।

(v) পানীয় জলের সমস্যা : দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের সর্বত্র পানীয় জলের সমস্যা আছে। কারণ জলের জোগান চাহিদার তুলনায় কম। দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়ং প্রভৃতি বড়ো শহরে প্রচুর পর্যটক আসে বলে এ-সব শহরে জলের সমস্যা তীব্র। শুধু দার্জিলিং শহরেই দৈনিক জলের ঘাটতি প্রায় 13 লক্ষ গ্যালন [তথ্যসূত্র : indiawater portal. org/articles/flourishing-water-markets-darjeeling]। স্থানীয় ঝরনা থেকে জল ধরে বহু লোক দৈনিক বা মাসিক চুক্তিতে মোটা টাকার বিনিময়ে জল বিক্রি করে। গ্রামাঞ্চলে মানুষ বৃষ্টির জল ও ঝরনার জল (স্থানীয় ভাষায় "ঝোড়ার জল") ব্যবহার করে।

(vi) গোর্খাল্যান্ড ও দার্জিলিং পাহাড়ে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত সমস্যা : এটি মূলত সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যা। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাদুটি অষ্টাদশ শতকে সিকিম ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নেপালের অধীনে ছিল। পরে 1835 সাল নাগাদ এই ভূখণ্ড ইংরেজদের দখলে আসে। ফলে এখানে সিকিমের লেপচা ও নেপালের নেপালি সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যায় বেশি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দার্জিলিং-এর নেপালি ভাষী লোকজন নেপালি ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিতে আন্দোলন করেছে। 1992 সালে আগস্ট মাসে নেপালি ভাষা ভারতীয় সংবিধানের অষ্টম তপশিল (Eigth Schedule)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

এর আগে 1981 সাল থেকে দার্জিলিং, ডুয়ার্স ও তরাই অঞ্চলের নেপালিভাষী এলাকাগুলি একত্র করে গোর্খাদের নিজস্ব বাসভূমি হিসাবে ভারতের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য রূপে গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবি ওঠে। 1986 সালে ওই আন্দোলন চরমে পৌঁছায়। রক্তক্ষয়ী ওই আন্দোলনে দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চল বিধ্বস্ত হয়। বহু লোকের মৃত্যু হয়। বহু মাস সমস্ত কাজকর্ম প্রায় বন্ধ থাকে। GNLF বা গোর্খা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন এই আন্দোলন চালায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন সুবাস ঘিসিং। 1988 সালে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল (DGHC) নামে একটি প্রায় স্বয়ংশাসিত (semi-autonomous) সংস্থা গঠনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবি স্তিমিত হয়।

2007 সালে GJM বা গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নামে আর-একটি রাজনৈতিক সংগঠন পুনরায় গোর্খাল্যান্ড গঠনের দাবিতে আন্দোলনে নামে। 2017 সালের জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এই আন্দোলন 1986 সালের মতোই রক্তক্ষয়ী হয়ে ওঠে। DGHC-র পরিবর্তে GTA বা গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নামে একটি স্বয়ংশাসিত কাউন্সিল 2011 সালে গঠন করা হয়। এর কাজকর্মের পরিধি পরে আরো পরিবর্তন করা হয়েছে। বস্তুত 2014 সালে অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে তেলঙ্গানা রাজ্য গঠনের পরপরই গোর্খাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি জোরদার হয়ে ওঠে।

(vii) দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলের আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানে গৃহীত পদক্ষেপ :

(a) ধস একটি চিরস্থায়ী সমস্যা। এই সমস্যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী (building rules) তৈরি করা হয়েছে। ধস নিরোধক বিভিন্ন ধরনের পাঁচিলের নির্মাণ প্রযুক্তিগতভাবে আরো উন্নত করা হয়েছে। জলনিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বনসৃজনের কাজ চলছে।

(b) চা শিল্পের সমস্যা মূলত আবহাওয়ার পরিবর্তন ও রুগ্ন চা-বাগানগুলির সঙ্গে জড়িত। বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য খাদ্যসাথী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। চা-বাগানভিত্তিক পর্যটন ব্যবস্থা শুরু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন্ধ চা বাগান শ্রমিকদের বোনাস দেওয়ার ব্যাপারেও আলোচনা চলছে।

(c) পর্যটন ক্ষেত্রকে জোরদার করার জন্য প্রচুর "হোম স্টে" (home stay)-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(d) দার্জিলিং পাহাড়ি অঞ্চলে নতুন পর্যটন কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে, যেমন সান্দাক্‌ফুর পথে সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্ক, কালিম্পং-এর দেওলো হিল, কালিম্পং-এ চা-বাগান ও কাঞ্চনজঙ্ঘার সৌন্দর্য একসঙ্গে উপভোগ করার জন্য মর্গ্যান হাউস, নেওড়া ভ্যালি ন্যাশনাল পার্ক প্রভৃতি।

(e) পানীয় জলের ব্যাপারে দার্জিলিং শহরে সাহেবদের আমলে তৈরি সেঞ্চল লেক-এর (Senchal) জোড়া জলাধার ছাড়া আর কোনো নতুন উৎস তৈরি করা সম্ভব হয়নি। তবে সেঞ্চল-এর জলধারণ ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিভিন্ন ঝোড়া বা ঝরনার জলকে যতটা সম্ভব নষ্ট না-করে পাইপ লাইনের সাহায্যে বা বড়ো ট্যাংকে ভরে বা ছোটো টিনের পাত্র/জেরিকেন-এ ভরতি করে বেসরকারি উদ্যোগে বাড়িবাড়ি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জলের এই ব্যাবসা করে অনেকের আয় হচ্ছে।

(f) স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (GTA)-এর কার্যপদ্ধতি আরো স্পষ্ট ও দক্ষ করা হয়েছে। ফলে গোর্খাল্যান্ডের দাবি আপাতত বন্ধ আছে।

15.3. সুন্দরবনের আঞ্চলিক সমস্যা (Regional problems of the Sundarban) :

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণের জেলা উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে হুগলি নদীর মোহনায় গঙ্গার ব-দ্বীপে এবং বঙ্গোপসাগরের উত্তর সীমায় সুন্দরবনের ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের অংশটি অবস্থিত। ভৌগোলিক অঞ্চল হিসাবে সুন্দরবন শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। পূর্ব দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণ সীমায় পদ্মার মোহনার ওপরেও সুন্দরবন বিস্তৃত রয়েছে (চিত্র 15.2)। বর্তমান আলোচনায় সুন্দরবন বলতে ভারতের অংশটুকুকে বোঝানো হয়েছে।

> **ড্যামপিয়ার-হজেস লাইন (Dampier-Hodges Line)**
>
> 1829-1830 সালে উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা অঞ্চলে জনবসতি ও বনভূমির বিস্তার সম্পর্কে ড্যামপিয়ার এবং হজেস সাহেব যে-জরিপ ও সমীক্ষা করেন তার ভিত্তিতে পশ্চিমে কুলপি থেকে পূর্ব দিকে বসিরহাট পর্যন্ত সেই সময়ে সুন্দরবনের বনভূমির সীমা নির্ধারিত হয়, যা ড্যামপিয়ার-হজেস লাইন নামে পরিচিত হয়েছে। বর্তমান কালে ড্যামপিয়ার-হজেস লাইনের অনেক দক্ষিণে বনভূমি সরে গেছে। কারণ বন কেটে চাষের জমি ও জনবসতি তৈরি হয়েছে।

(1) অবস্থান : গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহানায় 25,500 বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে সুন্দরবন অবস্থিত। মোট আয়তনের প্রায় 34 শতাংশ স্বাধীনতার পরে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এর আয়তন 9,630 বর্গকিলোমিটার। এর মধ্যে বর্তমানে মাত্র 4,267 বর্গকিলোমিটার অঞ্চলে ম্যানগ্রোভজাতীয় অরণ্য আছে।